ভোরের কাগজ

৮/৯/২০০১

তারিখ ...... পৃষ্ঠা ... কলাম ...

দিবস

আজ আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস

নিরক্ষরমুক্ত সচেতন সমাজ গড়ার লক্ষ্যে জাতিসংঘ ও ইউনেস্কোর সদস্যভুক্ত প্রতিটি উন্নত ও উন্নয়নশীল দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ পালিত হচ্ছে আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস। এর সাথে পালিত বয়স্ক শিক্ষা সপ্তাহেরও পাঁচ বছর পূর্তি হচ্ছে এবার। মূলত সমাজ থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণমুক্ত কর্মকাণ্ডের আওতায় নতুন মাত্রা সংযোজন, সমস্যা চিহ্নিতকরণ, চিহ্নিত সমস্যাদি সমাধানে পদক্ষেপ গ্রহণ, ব্যাপক জনগণকে সম্পৃক্ত ও উদ্বুদ্ধকরণ এবং সর্বস্তরে জাগরণ সৃষ্টি ও তা বাস্তবায়নে প্রেরণা ও উদ্দীপনা যোগানোর দৃপ্ত অঙ্গীকারে বেশি প্রতিবছর ৮ সেপ্টেম্বর দিনটি পলিত হয়। বিশ্বের দিনটি পালিত হয়। বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় দিবসটির তাৎপর্য আমাদের দেশে তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি– কারণ এশিয়াতো দূরের কথা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায়ও আমাদের সাক্ষরতার হার সবচেয়ে কম। যদিও গত এক দশকে অবস্থার বেশ উন্নতি হয়েছে তারপরও সাক্ষরতা দিবসের পাশাপাশি বয়সব শিক্ষা সপ্তাহ উদ্‌যাপন মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার ১৯৯৭ থেকে এক্ষেত্রে অগ্রগতির নতুন মাত্রা যোগ করেছে যার ইতিবাচক বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এক দশক পূর্বে (১৯৯১ সালে), ৩৫.৩ শতাংশ সাক্ষরতার হার বেড়ে বর্তমানে (২০০১) তা ৬৫ শতাংশে উন্নীত হওয়া। এটা আমাদের মতো উন্নয়নশীল দেশের জন্য আর্থ-সামাজিক প্রেক্ষাপটে একটি অসমন চ্যালেঞ্জের উত্তরণ।

এ বছর আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উদ্‌যাপনের গৃহীত প্রস্তাবের চার দর্শক পূর্তি হচ্ছে। ১৯৬১ সালে প্রথম জাতিসংঘ সাধারণ অধিবেশনে বিশ্ব থেকে নিরক্ষরতা দূরীকরণে প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত এবং সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। যার ধারাবাহিকতায় বিভিন্ন চড়াই-উতরাই পেরিয়ে ১৯৬৭ সাল থেকে বিশ্বব্যাপী 'আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস' পালিত হয়ে আসছে। এর সূচনাবর্ষে প্রথমবারের মতো পাঁচ হাজার ডলার মূল্যমানের প্রথম আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা পদক রেজা শাহ পাইলভী পুরস্কার ন্যমে প্রবর্তিত হয়। এছাড়া ইউনেস্কোর প্যারিস কর্তৃপক্ষ শুরু থেকে এই কর্মসূচিকে উদ্বুদ্ধকরণের লক্ষ্যে বিভিন্ন শাখায় আরো চারটি পুরস্কার প্রদান করে আসছে। বাংলাদেশ ১৯৯৮ সালে একবার এই পুরস্কার লাভ করে। এছাড়া দেশের একটি শীর্ষ স্থানীয় সেরকারি সংস্থা ব্র্যাক তাদের উপ-আনুষ্ঠানিক প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রমের সার্বিক সফলতার জন্যও ইতিমধ্যে লাভ করেছে সাক্ষরতা পুরস্কার। পুরস্কার সাফল্যের স্বীকৃতি– নিঃসন্দেহে কর্মউদ্দীপনা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কাজের গুরুত্বও বাড়িয়ে তোলে। কিন্তু নিরক্ষরতা দূরীকরণের মতো মৌলিক কর্মকাণ্ডে সম্পৃক্তা পুরস্কারের চেয়ে অধিক গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হয় সামাজিক দায়িত্ব ও সাংবিধানিক অঙ্গীকার হিসেবে। এটা রাষ্ট্রের প্রতি প্রতিটি স্বাক্ষর মানুষের অলিখিত কর্তব্যের প্রত্যয় হিসেবেও বিবেচিত। জাতীয় ঘটনার আর্বতে বিশেষ করে আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্মকাণ্ডের এই পরিসরে উদ্‌যাপিত এবারকার আন্তর্জাতিক সাক্ষরতা দিবস উপলক্ষে সীমিতভাবে হলেও বেশ কিছু কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। অন্যান্যবারের মতো সভা, সমাবেশ, র‍্যালি, সেমিনার, কর্মশালা, গণশিক্ষা মেলা, পথ নাটক, গণসঙ্গীত, পোস্টার, ব্যানার, স্টিকার, লিফলেট এবং ক্রোড়পত্র প্রকাশসহ যাবতীয় প্রচার প্রচারণার বাড়াবাড়ি না থাকলেও সরকারের উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা অধিদপ্তর, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিভাগসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ আশা করছেন নিকট অতীতের মতো এবারও দিবসটি তের কোটি মানুষের মাজে সাক্ষরতার তাৎপর্য তুলে ধরে যথাযথ গুরুত্বের সঙ্গে পালিত হবে। সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে 'বাঁচার জন্য– শিক্ষা চাই'– 'শিক্ষা ছাড়া উপায় নাই' এবারকার দিবসের মূল প্রতিপাদ্যের ওপর ভিত্তি করে বেশ কিছু কর্মসূচি প্রণয়ন করেছেন। তবে নির্দলীয় তত্ত্বাবধায়ক সরকারের শাসনাধীনে নির্বাচনের প্রাক্তিকলগ্নে শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক দলসমূহ অগ্রাধিকার ভিত্তিতে দেশে সাক্ষরতা কার্যক্রম গতিশীল ও জোরদার করতে অঙ্গীকার ব্যক্ত করবে বলে সকলেই আশাবাদী। যা পরবর্তীতে সরকারের কিংবা সরকারের বাইরে থাকলেও নিরক্ষরতামুক্ত বাংলাদেশ গড়তে প্রতিটি সচেতন নাগরিককে উদ্দীপ্ত করবে। একতা অনস্বীকার্য যে প্রতিটি জনপ্রতিনিধিত্বশীল সরকার জনগণের মৌলিক চাহিদা পূরণে বরাবরই উদ্বিগ্ন থাকে। মানব সম্পদ উন্নয়ন সম্পৃক্ত বিষয় হিসেবে সাক্ষরতা তথা সার্বিক শিক্ষার বিষয়টি এক্ষেত্রে অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ। কারণ, যথাযথ শিক্ষা ছাড়া যেমন উন্নত জাতির আশা অমূলক। তেমনি ন্যূনতম অক্ষরজ্ঞান ছাড়া সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী কখনোই স্বাবলম্বী হতে পারে না।

প্রগতিশীল, উন্নয়ন মনস্ক জাতি হিসেবে নব্বইয়ের দশক থেকে (১৯৯০ থেকে) দেশে 'সবার জন্য শিক্ষা' বিষয়ক বিশ্ব সম্মেলনে বাংলাদেশ বিশ্ব ঘোষণার সঙ্গে একাত্মতা প্রকাশ করে। যার প্রেক্ষিতে তৎকালীন বিশ্ব কর্মসূচির ভিত্তিতে দেশে জাতীয়ভাবে সাক্ষরতা কার্যক্রম বাস্তবায়নের সুদূরপ্রসারী কর্মপরিকল্পনার আওতায় নিম্নোক্ত চারটি লক্ষমাত্রা নির্ধারিত হয় :

- ❑ পরবর্তী এক দশকে স্কুলে ছাত্র-ছাত্রী ভর্তির হার মোট শিক্ষার্থীর ৯৪ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ❑ প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ভর্তির হার ৯৫ শতাংশে উন্নীতকরণ।
- ❑ প্রাথমিক শিক্ষা স্তর থেকে বাদ পড়া শিক্ষার্থীর হার অন্যূন ৩০ শতাংশ হ্রাসকরণ।
- ❑ বয়স্ক সাক্ষরতার হার শতকরা ৬২ শতাংশে উন্নীতকরণ ইত্যাদি।

উপরোক্ত লক্ষ্যমাত্রা থেকে এই সময়ে বেশ কিছু ক্ষেত্রে সরকার যে সফলতার সাক্ষর রেখেছে তা বাস্তব সত্য। একমাত্র বাদ পড়া শিক্ষার্থীর হার হ্রাসকরণ ছাড়া অন্যান্য ক্ষেত্রসমূহে সফলতার অন্যতম কারণ হিসেবে সরকারি কর্মসূচির সঙ্গে দেশে তৃণমূল পর্যায়ে কর্মরত বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা ও সামাজিক-সাংস্কৃতিক সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানকে সম্পৃক্তকরণের মাধ্যমে উপ-আনুষ্ঠানিক, অনানুষ্ঠাৎপনিক ও বয়স্ক ও নারী শিক্ষার প্রসারতা এবং এর বাস্তবায়ন সফলতাকে চিহ্নিত করেছেন। যা ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিকভাবেও প্রশংসিত হয়েছে। সুদীর্ঘকাল ধরে চলে আসা প্রাতিষ্ঠানিক ধাচে আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অবয়ব অক্ষুণ্ন রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারের পাশাপাশি সম্পূরক ও সহায়ক শিক্ষা হিসেবে উপ-আনুষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থা ইতিমধ্যে বেশ কার্যকরী হিসেবে সর্বগ্রাহ্য হয়েছে। যার ফলশ্রুতিতে বাধ্যতামূলক প্রাথমিক শিক্ষা, মাধ্যমিক শ্রেণী পর্যন্ত অবৈতনিক নারী শিক্ষা, ছাত্রী উপবৃত্তিসহ বিভিন্ন বিন্যাস সবার জন্য শিক্ষাকে ব্যাপক জনগণের দোরগোড়ায় পৌছানোর সুযোগ করে দিয়েছে। মাত্র দশ বছরে দেশের শিক্ষার হার দ্বিগুণ বৃদ্ধির মাধ্যমে সর্বস্তরের সাক্ষরতার যে সম্ভাবনা উন্মোচিত হয়েছে তাকে পূর্ণতা দিতে অগ্রবর্তী এ জাতীয় কার্যক্রমে যে যার অবস্থান থেকে সকলের ঐকান্তিক সম্পৃক্ততা হোক আমাদের আজকের অঙ্গীকার।

❑ সেলিম নজরুল